Vol. 38 | No. 2 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা : উৎসের সন্ধান

Volume	38
Issue	2
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জামরুল হাসান বেগ
Published online	February 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i2.7
Pages	129-147
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
৩৮ বর্ষ : সংখ্যা ২

Check for updates

নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা : উৎসের সন্ধান

জামরুল হাসান বেগ

নজরুল-মানসে অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের সূত্রপাত তাঁর শৈশব থেকেই। কৈশোরে জীবিকা-নির্বাহের কারণে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হয়েছে তাঁকে। তারপর *মৈমনসিংহ-গীতিকায়* সমৃদ্ধ ময়মনসিংহ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কিছুদিন কাটিয়েছেন তিনি। ইসলামের শ্বাশত মানবতার বাণীকে রচনার উপজীব্য করেছেন নজরুল ইসলাম। কিন্তু তার মধ্যে অন্য ধর্মকে হেয় করার প্রবণতা নেই। বরং 'নাতে-রসুল'-এর পাশাপাশি শ্যামাসঙ্গীত রচনায়ও সমান পারদর্শিতা নজরুল-প্রতিভার অন্যতম বিস্ময়কর সাফল্য। কবিতা, গান, উপন্যাস, প্রবন্ধে নজরুল ইসলামের অসাম্প্রদায়ি চিন্তা-চেতনার উৎস-সন্ধান বর্তমান নিবন্ধের মূল উপজীব্য।

প্রভাষক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক

কবিতা-দর্শন-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশ শতকের এক বিস্ময়কর প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। নৈরাশ্য হাহাকারে উন্মাতাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)-উত্তর পৃথিবী, নবজীবনের প্রত্যাশা-আন্দোলিত 'শ্রমশক্তির আত্মচেতনা মুখরিত জয়ধ্বনি' [সুশীল কুমার গুপ্ত ১৩৮৪ : ২০] তে প্রকম্পিত রাশিয়া (১৯১৭); খেলাফত অসহযোগ (১৯২০-১৯২২) সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন-এর মূলমন্ত্র সম্পৃক্ত মানুষের অন্তর-জিজ্ঞাসা ও প্রত্যাশায় অস্থির ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক অঙ্গন; সর্বোপরি নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পৈশাচিক তৎপরতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন দেশ-মানুষ-মানবতা, বিবদমান সম্প্রদায়ের বিচার বিবেকহীন আবেগ ও ঈর্ষায় দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষ,— যুগ ও জীবনের এই সন্ধিক্ষণে নজরুলের আত্মপ্রকাশ ও উদ্দাম অভিযাত্রা। শৈশব ও কৈশোরে অর্জিত যে-চাপল্য ও জীবন সংগ্রামের মন্ত্রণা, পুরাণ-ইতিহাস-ঐতিহ্য সমাজ-সংস্কৃতি ও মানুষের মানবিকতার অন্তর্নিহিত সত্যজগতে তাঁর মুগ্ধদৃষ্টিকে আকৃষ্ট করতে ও তাঁকে অনুসন্ধানী করে তুলতে সমর্থ হয়েছিল, সেই সঞ্চিত ধনই পরবর্তীকালে তাঁকে উত্তাল যুগ-সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে চলমান তরণীর নির্ভয়চিত্ত ও সংকোচহীন কাণ্ডারী নির্বাচনে শর্তহীন সমর্থন প্রদানে দ্বিধা করেনি। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ যুগের উন্মাদনায় দিশাহীন ও অস্তিত্বহীনতার দুঃস্বপ্নে শঙ্কাতুর মানুষের নিজ নিজ অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ তৎপরতা; সর্বোপরি পারস্পরিক জিঘাংসুপ্রবণ মানসের বিবেকহীন ও মানবতা বিরোধী এবং অপরিপুষ্ট ও সঙ্গতিহীন সুরধ্বনিকে মানবিকতার সুরযন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার সুশ্রাব্য কোরাস নির্মাণে নজরুলের যে প্রচেষ্টা, তার পিছনের কার্যকর ছিল তাঁর আশৈশব অর্জিত সেই উপাদান-উপকরণের নির্ভেজাল সত্যতা ও চিরন্তনত্ব।

সাহিত্যক্ষেত্রে নজরুলের আবির্ভাব, কবিত্ব শক্তির পরিচর্যা ও বিকাশ যেহেতু বিশ শতকের প্রথম তিন দশকেই, সেহেতু এ সময়ের বিশ্ব তথা ভারত উপমহাদেশের অস্থির জীবনের দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁকে আন্দোলিত করেছে। কেননা যুগধর্মকে অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাওয়া বড় মাপের কোনো কবির পক্ষে সম্ভব নয়। নজরুলও এর ব্যতিক্রম নন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা-চাহিদা ও দ্বন্দ্ব-বিভেদ কাটিয়ে ঐকতার সুরযন্ত্রের মহামিলনের সুর সৃষ্টিতে নজরুলের প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা এবং সাফল্য তাঁর সার্থক প্রতিনিধিত্বেরই প্রমাণ; যা তাঁকে বড় মাপের কবির মর্যাদা প্রদান করে। আসলে, হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির ঐকতার বাণী তাঁর কাব্যে ধ্বনিত; যা সমকালীন চেতনাসমৃদ্ধ। রাজনৈতিক মতাদর্শের সাময়িক ঐকতায় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে যে সমঝোতা, তা দীর্ঘায়ু লাভ না করলেও এ

প্রেক্ষিতে নজরুলের যে অভিযাত্রা তা কখনো থমকে দাঁড়ায়নি। এজন্যই হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা অপরিমেয়। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার খোলস অবমুক্ত করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টিতে তাঁর যে উদারতা, তার মূল উদ্দেশ্য পরাধীনতামুক্ত ভারত উপমহাদেশ। মোটকথা, নজরুল-পূর্বযুগে কিংবা সমসাময়িককালে নিজস্ব সম্প্রদায়ের সীমানা অতিক্রমণের সদিচ্ছা কোনো কবির কর্মতৎপরতায় পরিলক্ষিত হয় না; ছিটে-ফোঁটা পরিচয় পাওয়া গেলেও সামগ্রিক সাফল্য লাভে কেউ সমর্থ হননি। সাম্প্রদায়িকতা-কলুষিত পটভূমিতে এ ধরনের দুঃসাহসী অভিযাত্রা এবং তাতে সাফল্যের বিজয় অভিধা নজরুলই প্রথম অর্জন করেন। অবশ্য স্মর্তব্য যে, 'তার অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বই থেকে পাওয়া জ্ঞান নয়; নয় কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী ও আদর্শ থেকে পাওয়া [আতাউর রহমান ১৯৮৭ : ১২২]।' বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতারই জারকরসে নিষিক্ত তাঁর দর্শন।

দুই

নজরুল-মানসে অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের সূত্রপাত তাঁর শৈশব থেকেই। আমরা জানি, তাঁর জন্ম গোঁড়া মুসলিম পরিবারে এবং পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রেই ইসলামি আচার-রীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অনুপ্রবেশ আর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ বিষয়ে তাঁর সফলতা অর্জন। ধর্মীয় শিক্ষালাভে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও তিনি কেবল নিজস্ব ধর্মীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও রীতি-নীতির গণ্ডিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। 'যেখানে কীর্তন হত, কথকতা হত, যাত্রাগান হত, মৌলবীর কোরান পাঠ ও ব্যাখ্যা হত, দুরন্ত বালক গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন। বাউল, সুফী, দরবেশ, সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন [সুশীলকুমার গুপ্ত ১৩৮৪ : ৩৫]।' আর জীবিকা নির্বাহের প্রথম পরীক্ষায় তাঁর যে ক্ষেত্র, তাতেও সফলতা লাভের জন্য নিজস্ব ধর্মীয় ঐতিহ্যের সীমানা পেরিয়ে তাঁকে অনুপ্রবেশ করতে হয় ভিন্ন আচাররীতি, পুরাণ-কাহিনী সমৃদ্ধ ধর্মীয় ক্ষেত্রে। বেঁচে থাকার সংগ্রামে অবতীর্ণ নজরুলের সম্প্রদায়গত বিভেদ চিন্তাসম্পৃক্ত ভাবনা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেনি। বরং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের প্রকাশই অনিবার্য হয়ে উঠেছে। অস্তিত্বের সংগ্রাম এবং জ্ঞানপিপাসু মনের অবদমিত ইচ্ছে তাকে এ ব্যাপারে বেশি সহায়তা দান করেছে। লেটোদলের অন্যতম সদস্য হিসেবে গান রচনা করে জীবিকা নির্বাহের আশা তাকে বাধ্য করেছে হিন্দু-মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে; আর এ বাধ্যবাধকতা পরমুহূর্তে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনকে ব্যাপক বিস্তৃত পটভূমির মাঝখানে দাঁড়ানোর প্রেরণা যুগিয়েছে। হিন্দু-মুসলিম পুরাণ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই উভয় ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য উদঘাটন তাঁর পক্ষে সম্ভব

হয়েছিল। আর এ অন্তর্নিহিত সত্য মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েই তাঁর হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল অসাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বল আলো।

আজীবন দুঃখের সঙ্গে নজরুলের সখ্য। মাত্র ন'বছর বয়সে দুঃখ অতিক্রমণের নিজস্ব দায়িত্ব বর্তেছে তাঁর ঘাড়ে, একথা সর্বজনজ্ঞাত। অর্থনৈতিক সঙ্কট, তদুপরি পারিবারিক সঙ্কটের প্রেক্ষিতে স্নেহ-মমতা-ভালবাসার স্বল্পতা তাঁকে ভিতরে ভিতরে নিঃস্ব করে দেয়। শৈশব-কৈশোরের এই স্নেহবঞ্চিত, দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট, বাধা বন্ধনহীন দিনগুলোতে তাঁর সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, স্নেহ-মমতা-ভালবাসার সান্নিধ্য লাভ। এ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়েছে সম্প্রদায়ভেদে—হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মনুষ্যত্বের অধিকারী মানুষের সংস্পর্শে। আর সম্প্রদায় ভেদে মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত অকুণ্ঠ ভালবাসা তাঁর মনে অভিনব বোধের জন্ম দিয়েছে। তাঁর কাছে ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বর বড় নয়, বড় হয়ে উঠেছে মনুষ্যত্ব; মানবিক গুণাবলি। শৈশব-কৈশোরের এই উপলব্ধি পরবর্তী জীবনে বিস্তৃতি লাভ করে। মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার বিচারে তাঁর কাছে মানুষের ধর্মীয় কিংবা সাম্প্রদায়িক পরিচয় বড় হয়ে উঠেনি। সামগ্রিক অর্থে, কোনো ধর্মেরই আজীবন আচরিত বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ রীতি-নীতির ধারায় নিজেকে পরিচালিত করেননি। ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যই তাঁর কাছে প্রধান। ধর্মীয় রীতি-নীতির বাহ্যিক আড়ম্বর তাঁকে মুগ্ধ করে না। তাঁর ধর্ম 'মানবধর্ম'। এই মানবধর্মের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠাতেই তাঁর আজীবন সংগ্রাম। যেখানেই এর সন্ধান পেয়েছেন, সেখানেই ফেলেছেন স্বস্তির নিঃশ্বাস। এই বোধ তাঁকে অসাম্প্রদায়িক কবি হিসেবে পরিচিতি এনে দিয়েছে সহজেই। পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা-সঙ্কট ও স্নেহ-মমতার অভাব, এ সবের সূত্রধরে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে বাল্যকালেই তাঁর পরিচয় অনিবার্য না হয়ে উঠলে নজরুলও সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকগণের পথ ধারা থেকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত হতে পারতেন না, এমনটা ধারণা করা অযৌক্তিক নয়। পারিবারিক পরিবেশের বিরূপতা ও দায়বদ্ধতা তাঁকে স্বতন্ত্র পরিচয়ের পথ-নির্দেশনা প্রদান করেছে।

ভাগ্যের ছন্দহীন উত্থান-পতন কিশোর নজরুলকে বার বার অনাকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতার বহুবিচিত্র পথে নিয়ে গেছে। ভাগ্যের অনির্দিষ্ট ছকে পথ চলতে চলতেই তাঁর আগমন পূর্ব বাংলায়। মানসগঠনের প্রস্তুতিপর্বে পূর্ব বাংলায় নজরুলের আগমন ও অল্প কিছু দিন অবস্থান, ময়মনসিংহের দরিরামপুর ও কাজীর সিমলাকে করেছে ধন্য। নজরুলের সান্নিধ্য শুধু যে এ অঞ্চলকে পণ্যভূমি করেছে তাই নয়, এ অঞ্চলের সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নজরুল-মানসে উপ্ত করেছিল এক শাশ্বত দর্শনের বীজ, যা পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে কিশলয় ও মহীরুহ হয়ে নজরুল-মানসে ছায়া ফেলে এবং কবি-মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিতি

লাভ করে। বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় বিষয় ও সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা মুক্ত প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন *মৈমনসিংহ গীতিকা* পূর্ববাংলার এ প্রত্যন্ত অঞ্চলেই রচিত। মধ্যযুগীয় ধর্মাচ্ছন্ন জীবনবোধের ক্ষেত্র থেকে *মৈমনসিংহ গীতিকাতেই* প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ-সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মানবিক আবেদন ধ্বনিত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক দর্শন সংবলিত এ সাহিত্যিক নিদর্শন এ অঞ্চলের সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই বাহক। হিন্দু কিংবা মুসলামন নয় 'ধর্ম ও সমাজ নিরপেক্ষ শাশ্বত মানবিক বৃত্তি দ্বারাই' [আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৫৭ : ৩২৮] নিয়ন্ত্রিত হয়েছে গীতিকার চরিত্রগুলি। *মৈমনসিংহ গীতিকার* অন্তর্নিহিত এই শাশ্বত মূল্যবোধ কিশোর নজরুলের মনোজগতে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছিল। 'নব্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ইসলাম ধর্মের উগ্রতামুক্ত পরিবেশ অব্যাহত থাকা এবং সমন্বয়মূলক বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের বিশিষ্ট ভূমিকা [সৈয়দ আজিজুল হক ১৯৯০ : ১২]' অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ যে সাহিত্যিক নিদর্শন সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল, সেই গীতিকা এবং পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য-সমাজ ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারীদের সংস্পর্শে নজরুল-মানসে অসাম্প্রদায়িকতার পরশ বুলিয়েছিল, এটা অবিশ্বাস্য নয়। স্বাধীনতাপূর্ব ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার (১৯২৬) বীভৎস পৈশাচিকতায় উন্মত্ত, তখন ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ধারাসূত্রেই এ অঞ্চল ছিল অসাম্প্রদায়িকতার জয়ধ্বনিতে মুখরিত। অল্প কিছু দিন অবস্থানেও এ অঞ্চলের ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বিষয় ও চরিত্র সংবলিত গীতিকা ও সমাজ-সংস্কৃতি তাঁর মানসলোকে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এখানে অবস্থানকালে এতদ্অঞ্চলের কৃষকদের সঙ্গে আড্ডা, তাদের সঙ্গে গান গাওয়া; রাত জেগে স্থানীয় জারী, যাত্রা, কবিগান, পালাগান ও পুঁথি পাঠের অনুষ্ঠানে দর্শক হিসেবে ঘন্টার পর ঘন্টা, রাতের পর রাত অংশগ্রহণ তাঁর অন্তরে ছড়িয়ে দিয়েছিল অসাম্প্রদায়িক-ধর্মনিরপেক্ষ বোধ ও দর্শনের প্রদীপ্ত আলো :

> দারোগা বাড়ির সামনে ছিল দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। এই মাঠ ছিল নজরুলের বিচরণক্ষেত্র। প্রায় সারা দিনই মাঠে পড়ে থাকতেন। কৃষকদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন, গলা ছেড়ে আপন মনে গান গাইতেন, বাঁশি বাজাতেন [মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ১৩৯৭ : ৭১]।

কিংবা

> ... এ অঞ্চলে বেশ যাত্রা, কবি ও খেমটা গান হ'ত— আনাতেন অবস্থাসম্পন্ন স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণই। তখন পৌষ সংক্রান্তি, দোল, দুর্গাপূজা ও অন্যান্য উৎসবে

পূর্বধলা ও বৈলর জমিদার বাড়ীতেও খেমটা, কবি যাত্রা ইত্যাদি গানও হত—চলতো ৭/৮ দিন। ... এছাড়া স্থানীয় বা বাইরের জারী, ঘাটু, এবং পুঁথির গান ত ছিলই। —জায়গীর বাড়ীতে বালিশ কাঁথার নিচে শুইয়ে রেখে ছনের সেই ঘরের খোলা জানালা দিয়ে বের হয়ে যেত— আসতো শেষরাতে ঘুম ঢুলুঢুলু। ... নজরুল পরদিন শুকনির বিলের ধারে এসব গান আমাদের গেয়ে শোনাতো— অবিকল বিশেষ করে যাত্রার বিবেকের গান [মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ১৩৯৭ : ৪৯]।

তাছাড়া স্থানীয় স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, হিন্দু-বাড়ীতে অবাধ যাতায়াত প্রভৃতি এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর বোধের সীমানার বিস্তৃত পরিধি নির্মাণে সহায়তা করে।

দরিরামপুর ও কাজীর সিমলায় নজরুল-জীবনের দিনগুলো ছিল সচেতনতায় ঋদ্ধ। নিজের ভবিষ্যৎ জীবন-পরিকল্পনা ও নিজেকে গড়ে তোলার চিন্তাজাত সচেতনতা তাঁর মধ্যে কার্যকর ছিল সর্বক্ষণ। স্থানীয় ঠুনিভাঙা বিলের ধারে বটতলায় বসে একাকী বাঁশি বাজানো এবং নিরাসক্ত দৃষ্টি মেলে চুপচাপ বসে থাকা; কিংবা পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নের উত্তর না লিখে কবিতা ও গানের ছন্দ বিষয়ক বিশ্লেষণ ও আলোচনা, তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও অভিপ্রায়ের ইঙ্গিতই বহন করে :

তিনি স্কুলে যাবার নাম ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সারা দুপুর স্কুলের সন্নিকটে ঠুনিভাঙা বিলের ধারে নিরাসক্ত দৃষ্টি মেলে বসে থাকতেন অথবা বাঁশী বাজাতেন [সুশীলকুমার গুপ্ত ১৩৮৪ : ৩৮]।

এবং

পরীক্ষার সময়ে নজরুল পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কবিতা ও গানের ছন্দ পরীক্ষা করিতেন [আমীর হোসেন চৌধুরী ১৯৬৮ : ৩]

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, ময়মনসিংহে নজরুলের প্রতিটি দিন-ক্ষণ ছিল সতর্ক সচেতনতায় ভরা। তাই এ অঞ্চলের সমাজ-মানুষ ও সংস্কৃতি তাঁর মনোলোকে স্থায়ী আসন লাভ করতে পেরেছিল। যার ফল হিসেবে পরবর্তীজীবনে অসাম্প্রদায়িক কবি হিসেবে তাঁর বিস্ময়কর পরিচিতি। বলা যায়, ১৯২৬ সালে ময়মনসিংহ জেলা কৃষক ও শ্রমিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হয়েও তাতে যোগদান করতে না পেরে কবি যে লিখিত বক্তব্য প্রেরণ করেন, তাতে উপর্যুক্ত মন্তব্যের পক্ষেই তাঁর সম্মতি :

> ... বড় আশা করেছিলাম, আমার সেই শৈশবচেনা ভূমির পবিত্র মাটি মাথায় লইয়া ধন্য হইব, উদার হৃদয় ময়মনসিংহ জেলাবাসীর প্রাণের পরশমণির স্পর্শে— আমার লৌহপ্রাণকে কাঞ্চনময় করিয়া তুলিব।

এই 'উদার হৃদয়' মানুষের অন্তর ঔদার্যের সঙ্গেই নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মিক যোগাযোগ।

কোনো অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ, জলবায়ু, জীবন প্রণালি, পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা সে অঞ্চলের মানুষের মানসিক বিবর্তনের প্রধান প্রেরণা-উৎস। এই প্রেরণা অর্জিত বহুবিচিত্র পথে জীবনের অন্তহীন রহস্যের দিকেই কবিমনের স্বাভাবিক অভিযাত্রা। তাই কোনো কবির মনোজগতের পরিচয় উদ্‌ঘাটনে এ অন্তহীন উৎসের অনুসন্ধান প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার 'শক্ত কঠিন রুক্ষ মাটি, লাল ধুলোয় ভরা' ধূসর রুক্ষ প্রান্তরের শুষ্ক প্রাণরূঢ়তার সঙ্গে কবি নজরুলের আজন্ম পরিচয়। অজয় নদীর সুবিস্তৃত বালুচর, লৌহ- ইস্পাত কারখানা, কয়লাখনি, জনাকীর্ণ শিল্পাঞ্চল, বন্যা প্রতিরোধ মাইথন, যন্ত্র ও মানুষ— এসবের মধ্যিখানে নজরুলের 'চুরুলিয়া' :

> উত্তরে অজয় নদীর সুবিস্তীর্ণ বালু বিস্তার। কাশগুচ্ছ সমাচ্ছন্ন পাণ্ডবেশ্বর মহাদেবের পাঁচটি মন্দির। ... দক্ষিণে কয়লাখনি আর লৌহ ইস্পাতের কল কারখানা সমাস্তীর্ণ জলবহুল-সুবিস্তৃত শিল্পাঞ্চল রাণীগঞ্জ আর আসানসোল। পশ্চিমে ... দুর্দান্ত দামোদরের দুরন্ত বন্যা প্রতিরোধ মাইথন। ... পূর্বে পলাশ রাঙা প্রান্তরের পাশে শাল তাল তমাল হরিতকীর বন। ... এরই মাঝখানে ছোট্ট একটি গ্রাম চুরুলিয়া [শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯৬০ : ১]।

এই বিচিত্র তরঙ্গায়িত 'রাঢ়ের উদাসীন প্রকৃতি' নজরুলের মনোজগতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তাই জীবনসম্পৃক্ত চিন্তাচেতনার জগৎ ছেড়ে ছকহীন জীবনের অলিতে গলিতে তাঁর উদাসীন পথ চলা। এই ধারাপথেই তিনি এসেছিলেন পূর্ব বাংলায়। পূর্ব বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশের মনোহারিত্ব, নদী মেখলা, শ্যামল সুন্দর স্নিগ্ধতা, বিল-হাওড়, কাদা-জল, সবুজ মাঠের কোমলতা, মানুষের পারস্পরিক হৃদ্যতাভরা নিভৃত পল্লির আঙ্গিনা, জাতিভেদের প্রতিবন্ধকতা-রহিত সংস্কৃতির উদার আবহাওয়া ও হৃদয় উৎসারিত কলহাস্য মুখরিত মানুষের কাছাকাছি অবস্থান নজরুলের উদাসীন ইচ্ছেতে সবুজ কোমল স্নিগ্ধতার পরশ বুলিয়ে দেয়। এ প্রেক্ষিতে তাঁর হৃদয়ে বিস্তৃত প্রকৃতির বিশালতা এবং জীবন ও মানুষের প্রতি অন্তহীন উপলব্ধির জাগরণ ঘটে। এই উপলব্ধিই পরবর্তীকালে তাঁকে চালিত করে মানবধর্মের শাশ্বত বিশ্বাসে। পূর্ব বাংলার ভূ-প্রকৃতি পরিবেশ ও

জীবনধারা শুধু নজরুলেই নয়, বাংলা সাহিত্যের দিকপাল রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) মানস প্রতিভায়ও ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। পদ্মা আর পদ্মা বিধৌত পল্লি-বাংলার সৌন্দর্য, মানুষ ও জীবন তাঁকে অধ্যাত্ম আর রোম্যান্টিক কল্পনার জগৎ থেকে নিয়ে এসেছিল মাটির মানুষের কাছাকাছি। আসলে '১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে নজরুল মাত্র এক বছর দরিরামপুর স্কুলে পড়েছিলেন, সেই তাঁর পূর্ব বাংলার সঙ্গে প্রথম পরিচয়, যা পরে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। বার বার তিনি ছুটে এসেছেন পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, গোমতী, কর্ণফুলী, সুরমা বিধৌত বাংলায়, যেখানে তিনি খুঁজে পেয়েছেন বন্ধু, ভ্রাতা, জায়া, মাতা [মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ১৩৯৭ : ৩৭]।' পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়াই মানুষের মধ্যে উদাসীনতা নয়, পারস্পরিক সৌহার্দ ও ভালবাসা, সর্বোপরি মানবিক বৈশিষ্ট্য জাগরণের অনুকূল। এই মানবধর্ম পরিচর্যার সূত্রপাত, বিকাশ এবং আকর্ষণেই মানব দরদী কবির বার বার পূর্ব বাংলায় ফিরে আসা।

তিন

বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কবি প্রতিভার যে-বিশালতা, সাম্প্রদায়িক ইতিহাস-ঐতিহ্য ও রীতি-নীতির দেয়াল ভেঙে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গময় সাম্প্রদায়িক বিরোধের দিনে হিন্দু ও মুসলিম— দু'টি পরস্পর বিরোধী ধারাকে পাশাপাশি বয়ে নিয়ে চলেছে, তা যে কী উদার ও বিস্তৃত মানসিকতার ফল তা সহজেই অনুমেয়। যে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে নজরুলের আবির্ভাব, তাতে নিজস্ব ধর্মীয় ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতায় কাব্য রচনা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সেই দিনগুলোতে উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের অধিকাংশই সচেষ্ট ছিলেন শুধু নিজ নিজ ধর্মীর ঐতিহ্যের উপস্থাপনা ও ধর্মীয় মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং নিজস্ব আধিপত্য বিস্তারে। কিন্তু সেই পরিবেশেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ও বিস্ময়কর নৈপুণ্যে নজরুল গেয়ে উঠলেন অসাম্প্রদায়িকতা ও সম্মিলনের গান। যুগবিচারে তাঁর এ ভূমিকা বিস্ময়কর, দুঃসাহসী এবং একই সঙ্গে অভূতপূর্বও বটে। মুসলমান সমাজের অতীত ঐতিহ্য ও হিন্দুর পুরাণকাহিনীকে সম্বল করে উভয় সম্প্রদায়কে ভণ্ডামী, দুর্নীতি, সকল প্রকার জড়তা ও বন্ধ্যাত্বের নিগড় থেকে মুক্ত করে জাগাতে চাইলেন নবজীবনের উন্মাদনায়; যার মূলকথা মানবিকতা ও ঐকতা; যা পরাধীনতার বিরুদ্ধে সম্মিলিত আন্দোলন সৃষ্টির একমাত্র হাতিয়ার। আসলে, 'ধর্মের নামে যে কোনো ধরনের মিথ্যাচার, ভণ্ডামী, সংকীর্ণতা; সর্বোপরি ধর্মান্ধতার নাগপাশ ছিন্ন করে তিনি ধর্মের সার সত্য 'প্রেম'কে তুলে ধরতে প্রত্যাশী। ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের ইতিহাস ও পুরাণের সঙ্গে আশৈশব ঘনিষ্ঠ পরিচিতির মাধ্যমে অন্তরে উপ্ত অসাম্প্রদায়িকতার যে

ক্রমবিকাশ কিশলয় ও মহীরূহ রূপে, এবং এ প্রেক্ষিতে অন্তর মানসিকতার যে স্থিরত্ব, কোনো বাধা বিপত্তিই তাঁকে তা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কেননা, সকল ধর্মের মূলকথা মানবধর্ম; এ মানবর্ধমই তাঁর আশৈশব অর্জিত অভিজ্ঞতা নিংড়ানো নির্যাস—যা একান্তভাবেই হৃদয় উৎসারিত ও অন্তরসম্পৃক্ত। ধর্মীয় বাহ্যিক রীতি নীতি বিস্মৃত বা অগ্রাহ্য সহজতর হলেও এই অন্তরসত্য থেকে বিচ্যুতি অসম্ভব। নজরুলের বিশ্বাসও তাই এই সত্যে নিবদ্ধ। তাই ভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী কুমারীকে বিবাহের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন প্রস্তাবের উত্তরে তাঁর যে বক্তব্য— তা মানবধর্মের শাশ্বত বাণীকে মূর্ত করে :

> ... আমরা বল্লাম : "কনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হোক।" কবি এতে রাজী হলেন না। বল্লেন : " কারুর কোনো ধর্মমত সম্বন্ধে আমার কোনো জোর নাই। ইচ্ছে করে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে, পরেও করতে পারবেন [খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন ১৯৭৮ : ৪৯]।

হিন্দু কুমারীকে বিয়ে করার দায়ে পরবর্তী সময়ে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে সীমাহীন গঞ্জনা ও অত্যাচার। তিনি অত্যাচারিত হয়েছেন গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ ও মুসলমান কর্তৃক। সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস-কর্কশ কণ্ঠ তাঁকে বিধর্মী কিংবা উন্মাদ আখ্যা দিতেও বিরত থাকেনি। কিন্তু তাই বলে নজরুল তাঁর চিন্তাবোধ-দর্শন থেকে কখনোই বিচ্যুত হননি। অসাম্প্রদায়িকতার যে উজ্জ্বল আলো কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তাঁর হৃদয় আঙিনায়, তা তাঁকে আজীবন জাগরিত ও মুখরিত রেখেছে। তাঁকে করেছে নির্ভীক, ন্যায়নিষ্ঠ, বিদ্রোহী সৈনিক: এবং তাঁর নিজস্ব অভিপ্রায় ও প্রজ্ঞা দুঃসাহসী অভিযাত্রীর মতো তাঁকে নিয়ত চালিত করেছে আপন পথ পরিক্রমায়।

চার

কবি নজরুল তাঁর রচনাকর্মে হিন্দু কিংবা মুসলিম ঐতিহ্য উপস্থাপনার মাধ্যমে হিন্দু কিংবা মুসলিম সমাজকে পরস্পরের প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তোলেননি। বরং উভয় সম্প্রদায়কে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। যে কোনো ধর্মের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও হৃদয়হীন রীতিশাসনে তাঁর অবিশ্বাস। তিনি চেয়েছেন সকল ধর্মের শাশ্বত ও কল্যাণকর আদর্শগুলো উপস্থাপিত করতে। এতে তাঁর নিজস্ব ধর্মমত অন্য ধর্মমত ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। বর্তমানকে পুনর্নির্মাণে নজরুল মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য স্মরণ করেছেন, কিন্তু তা অন্য সম্প্রদায়ের কথা বিস্মৃত হয়ে নয়। পারস্পরিক সদ্ভাবপূর্ণ সহাবস্থানের কথা তিনি কখনোই

ভোলেননি। তাই ইসলাম ধর্মের শাশ্বত আর্দশকে কাব্য বিষয় করলেও অন্য ধর্মের শাশ্বত আদর্শকে কখনোই আক্রমণ করেননি সাম্প্রদায়িক চিন্তাবোধে। অন্যান্য ধর্মের কল্যাণমুখী শাশ্বত আদর্শে তাঁর আস্থা। যদিও মানুষের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বান ইসলামের সাম্যমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণে, এর অর্থ এই নয় তিনি অন্য ধর্ম বিদ্বেষী। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বিত চিত্র উপস্থাপনে তাঁর যে প্রয়াস তা তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ *অগ্নিবীণা* (১৯২২)-র "প্রলয়োল্লাস," "শাত্-ইল-আরব," "রণভেরী", "আগমনী", "রক্তাম্বর ধারিণী মা", "মোহর্‌রম" কবিতায় সুস্পষ্ট। তিনি জাগাতে চেয়েছেন মুসলমানকে, ডাক দিয়েছেন হিন্দুকে। সুতরাং শুধু হিন্দু কিংবা মুসলমান নয়; সমগ্র সমাজ জীবনে পরিবর্তনের হাওয়া আনতেই তাঁর আজীবন প্রচেষ্টা। এটা স্পষ্ট যে, নজরুল-মানস ধর্মকে অস্বীকার করার পক্ষপাতী নয়। কিন্তু তাই বলে ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বরও সমর্থন করেননি। বরং তাঁর কাছে ধর্ম হলো নিয়মনীতির সোপান বেয়ে আত্মশুদ্ধির আলোকিত জগতে উত্তরণ; যা মানুষকে মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে, উজ্জীবিত করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য ও নতুন সৃষ্টির প্রেরণায়। আর ধর্মীয় আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মত্যাগের অনুশীলন, কবির কাছে দেশপ্রেমেরই প্রাথমিক অনুশীলন। অর্থাৎ তাঁর আগ্রহ ধর্মের অন্তরগত সৌন্দর্যে ও বোধে; যে বোধের জাগরণে মানুষ আচার সর্বস্ব ধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান পেতে পারে। তাই কবি ধর্মরক্ষার নামে বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত সৃষ্টির ঘোর বিরোধী। জাতিগত পরিচয়ে ধর্মের অন্তর্নিহিত সারসত্যকে অস্বীকার এবং শুধু নিজ সম্প্রদায়ের পরিচয় দিয়ে ইহলৌকিক ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় অযাচিত রক্তপাত, তাঁর কাছে ক্ষমাহীন অন্যায়। ধর্ম ও সমাজ জীবনের এই গ্লানিকর কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও আন্তরিক ঘৃণা জাজ্বল্যমান :

মনুঋষি অণু সমান বিপুল বিশ্বে যে বিধির,
বুঝলি না সেই বিধির বিধি, মনুর পায়েই নোয়াস্ শির।
ওরে মূর্খ ওরে জড়,
শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়,
(তোরা) চিন্‌লি নে তো চিনির বলদ, সার হ'ল তাই শাস্ত্র বওয়া।
(*বিষের বাঁশী* / জাতের বজ্জাতি)

কিংবা

জাতের চেয়ে মানুষ সত্য,
অধিকসত্য প্রাণের টান,

প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।
(*বিষের বাঁশী* /সত্য-মন্ত্র)

আসলে ধর্মীয় অনুশাসন, সম্প্রদায়গত ব্যবধান বা ধর্মগ্রন্থসমূহ মূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে মানুষকে বিচার নয়, বরং ভালবাসা কিংবা কল্যাণকর চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমেই মানুষকে মর্যাদা প্রদানে তাঁর সমর্থন :

তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।
হয়ত ইহারই ঔরসে ভাই ইহারই কুটির-বাসে
জন্মিছে কেহ— জোড়া নাই যার জগতের ইতিহাসে।
(*সাম্যবাদী* / মানুষ)

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা কবিচিত্তকে বেদনার্ত করেছে। ব্যথাতুর হৃদয়ের এই বেদনাঘন চিত্র তাঁর কবিতায় উপস্থাপিত :

জাতির পরান-সিন্ধু মথি' স্বার্থ-লোভী পিশাচ যারা
সুধার পাত্র লক্ষ্মী লাভের করতেছে ভাগ-বাঁটোয়ারা।
(*ফণিমনসা* /পথের দিশা)

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্বসুলভ সদ্ভাব তাঁর আকাঙ্ক্ষার ধন। তাঁর কামনা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন। এর বিপরীত চিত্র তাঁর মনে জন্ম দিয়েছে বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া। তবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনিবার্য সংঘাত-সংঘর্ষেও তাঁর এ ধরনের আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু ঘটেনি। বরং মৃত্যুর বিভীষিকাময় ময়দানে দাঁড়িয়েও তাঁর মন নতুন স্বপ্ন রচনায় তৎপর। তাইতো পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির লক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ ভুল সংশোধনের মাধ্যমে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এ প্রত্যাশা থেকে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে দূরে রাখতে পারেননি :

যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া !
প্রভাতে হবেনা ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।

করুক কলহ— জেগেছে তো তবু— বিজয় কেতন উড়া!
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন; স্বর্ণলঙ্কা পুড়া!
(*ফণিমনসা* /হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ)

কবির মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা বিকাশের পিছনে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে পরাধীন দেশমাতৃকার মুক্তি-চিন্তা। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়গত কলহ-বিবাদ জাতিগত সম্প্রীতিতে যে ফাটল ধরিয়েছে, তা দেশের স্বাধিকার আন্দোলনের পথকে করছে দীর্ঘায়িত। এই বোধ থেকেই তাঁর হৃদয় উৎসারিত পঙ্‌ক্তিমালা, ভারতবাসীকে জাগরিত করার অভিপ্রায়ে মুখরিত। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি এবং এ সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় রূপ দেওয়ার জন্য তাঁর মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তার উৎস তাঁর নিখাদ দেশাত্মবোধ :

(ঐ) বিশ্বছিঁড়ে আনতে পারি, পাই যদি ভাই তোদের প্রাণ।
(তোরা) মেঘ বাদলের বজ্র বিষাণ (আর) ঝড় তুফানের লাল নিশান।
(*ভাঙার গান* /মিলন-গান)।

জাতিভেদের অর্থহীন আস্ফালন তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছে। কেননা ধর্মীয় গোঁড়ামীর লজ্জাহীনতায় অনাকাঙ্ক্ষিত অসুন্দরের আগমন অবশ্যম্ভাবী, নজরুলের কবিদৃষ্টিতে এ সত্য ধরা না পড়ে পারেনি। নজরুলের আকাঙ্ক্ষা অত্যাচার-উৎপীড়ন মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সমসাময়িককালে সর্বক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে মর্মাহত করেছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন ঔপনিবেশিক শক্তির হৃদয়হীন শাসন-শোষণ, আর এর সহায়ক শক্তির এদেশীয় মানুষের সম্প্রদায়গত সম্প্রীতির অভাব। এ সমস্যা দূরীকরণে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তুলতে তাঁর উচ্চকণ্ঠ উচ্চারণ। কবি তাঁর কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে যেমন নিয়ে এসেছেন, তেমনি হিন্দু সংস্কৃতিকেও। আর এ দু'য়ের সমন্বয়ে সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি সৃষ্টিই তাঁর উদ্দেশ্য। 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ? ওই জিজ্ঞাসে কোনজন?/ কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র ! (*সর্বহারা* /কাণ্ডারী হুঁশিয়ার)। আমরা দেখি, অসহযোগ আন্দোলন বস্ত্রশিল্পে স্বাবলম্বী হওয়ার যে মন্ত্র দেশীয় মানুষের অন্তরে জাগিয়ে তুলেছিল, তারই সমর্থনে রচিত নজরুলের কবিতা 'চরকার গান'। অবশ্য তাঁর পূর্বসূরী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)-ও এ বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন; যা জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উজ্জীবিত করার আবেদন সংবলিত। নজরুলের কবিতায় সে সুর ধ্বনিত হলেও

তাঁর কবিমন আরো একধাপ এগিয়ে। তাই তিনি এ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বেশি করে অনুভব করেছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা সংগ্রাম যে বেগবান হতে পারে, একথা তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। 'চরকার গান'-এ ধ্বনিত হয়েছে নতুন দিনের নতুন আশার বাণী। অনাগত ভবিষ্যতের সুর-সঙ্গীত। তার মূলমন্ত্র সম্মিলিত প্রচেষ্টা; সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান :

হিন্দু-মুসলিম দুই সোদর,
তাদের মিলন-সূত্র ডোর রে
রচলি চক্রে তোর,
তুই ঘোর্ ঘোর্।
আবার তোর মহিমায় বুঝল দু'ভাই
মধুর কেমন মায়ের ক্রোড়।
(*বিষের বাঁশী* /চরকার গান)

কবিতায় হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য পুরাণের সমন্বয় সাধনে কবির যে উদারতা, তা বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও বিরল। সমসাময়িককালের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশেও 'মোরা এক বৃন্তে দু'টি ফুল হিন্দু মুসলমান।/মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।' (*পুতুলের বিয়ে*) কিংবা 'যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান!' উচ্চারণ বিস্ময়কর। মোটকথা, তাঁর অন্তরের ধর্ম 'প্রেম ধর্ম', যে প্রেম মানুষকে কল্যাণের পথে সুন্দরের পথে নিয়ে যেতে পারে। আর এ কারণেই 'বজ্র শিখার মশাল জ্বেলে' যে 'ভয়ঙ্কর'-এর আগমন বার্তা ঘোষণা করেন, তা অবশ্যই 'নবসৃষ্টির মহানন্দে' উজ্জীবিত; আর 'কাল ভয়ঙ্করের বেশে' কিংবা 'অগ্নি-পাথার-কলরোল-কলকোলাহল'-এর মধ্যেই সুন্দর এবং 'শান্তি শান্ত উদার'-এর আগমন প্রতীক্ষায় তাঁর প্রহর গোনা।

পাঁচ

নজরুল নির্দিষ্ট গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ধার্মিকতাকে অতিক্রম করে ধর্মের সারসত্য 'মানবিকতা'র ব্যাপক বিস্তৃত ক্ষেত্রে উপনীত হতে পেরেছিলেন। কবিতার ক্ষেত্রে এটা যেমন সত্য, তেমনি সঙ্গীতেও। বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য এবং সুর ও প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতায় বাংলা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুল এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বাংলা ভাষায় ইসলামি সঙ্গীত রচনার সূচনা, কৃতিত্ব ও সাফল্যের সম্পূর্ণ গৌরব তাঁরই। ইসলামি ঐতিহ্য ও আদর্শমণ্ডিত সৌন্দর্যলোকের আলোকধারার স্পর্শে তিনি

আলোকিত করেন ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম মানসের সঙ্গীত বিমুখ অন্ধকারজগৎ। তাঁর উদ্দেশ্যই বাঙালি মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। শুধু প্রকৃত ইসলামি সঙ্গীত রচনাই নয়, একটি নির্দিষ্ট ধারা সৃষ্টির সাফল্যও তাঁরই। ইসলামি সঙ্গীত রচনায় তাঁর এ দক্ষতা, আশৈশব লালিত মেধা-বোধ-দর্শন উৎসারিত বক্তব্য সমৃদ্ধ। ইসলামি ঐতিহ্য, শৌর্য-বীর্য ও ধর্মাচার বর্ণনার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য, মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পাপ পুণ্য ও ধর্মীয় আদর্শ-মূল্যবোধের কথা উপস্থাপন করেছেন। ধর্মীয় ঐতিহ্যের এ উপস্থাপন রূপক প্রতীকের আশ্রয়ে সম্পন্ন: যা ধৈর্য, ত্যাগ ও বীরত্বের অনুপ্রেরণায় সিক্ত করে মুসলিম সমাজ-অন্তর। তাঁর এতদ্‌বিষয়ক অসংখ্য সঙ্গীত তালিকায় 'তওফিক দাও খোদা ইসলামে', 'আল্লাকে যে পাইতে চায়', 'আল্লাতে যার পূর্ণ ঈমান', 'দে জাকাত দে জাকাত তোরা', 'ফোরাতের পানিতে নেমে', 'উঠুক তুফান পাপ দরিয়ায়', 'ধর্মের পথে শহীদ যাহারা', 'যে আল্লাহ্‌র কথা শোনে', 'তুমি আশা পুরাও খোদা'— শ্রেষ্ঠত্বের আসনে এগুলো সহজেই স্থান করে নেয়। এখানেই শেষ নয়। ইসলামি সঙ্গীতধারা সৃষ্টির পাশাপাশি শ্যামাসঙ্গীত-কীর্তন-ভজন এবং অন্যান্য ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনায় তাঁর আন্তরিকতা, কৃতিত্ব ও সাফল্য, অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গিরই নিঃসন্দেহ প্রমাণ। ইসলামি সঙ্গীত, কীর্তন বা শ্যামাসঙ্গীত যা-ই হোক, ধর্মীয় বিষয়ভিত্তিক রচনা হলেও এসবে সম্প্রদায়গত বিভেদ সৃষ্টির কোনো উদ্দেশ্য বা সম্ভাবনা ছিল না। কেননা বিষয়বস্তুতে উপকরণগত পার্থক্য সত্ত্বেও আদর্শগত উদ্দেশ্য কিন্তু একই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত। আর তা হচ্ছে আত্মশুদ্ধি অর্জন, মানবধর্ম অনুশীলন, ঈশ্বর- সান্নিধ্যের সাধনা। শুধু বিষয়গত ভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছেন ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। আসলে তাঁর অন্তর স্বপ্ন, ভারতবর্ষের 'সম্মিলিত সংস্কৃতি'। হিন্দু-মুসলিম ঐকতায়ই যার বাস্তবায়ন সম্ভব; নজরুল একথা কখনো বিস্মৃত হননি। তাঁর 'হৃদি পদ্মে চরণ রাখো', 'এল নন্দের নন্দন নব ঘন শ্যাম', 'রুমুঝুম রুমুঝুম রুম ঝুম নূপুর বাজে', তোমার মেয়ে যদি থাকতো উমা', 'রাধা কৃষ্ণ নামের মালা', 'মোর মাধব শূন্য মাধবী কুঞ্জে', 'রাধা শ্যাম কিশোর প্রীতম গোপাল', 'আমি কি সুখে লো গৃহে রবো', 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রসনা', 'আমার আনন্দিনী উমা', 'আমার উমা কই'— এ বক্তব্যেরই প্রতিফলন। শুধু বিষয় বৈচিত্র্যেই নয়; ইসলামি সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত ও কীর্তনের 'অপূর্ব সুরের ইন্দ্রজাল' সৃষ্টিতে তাঁর প্রচেষ্টা বাংলা সঙ্গীতে অভিনব সংযোজন। তাঁর এ বোধগত স্বাতন্ত্র্য বাংলা সঙ্গীতধারাকে করেছে বেগবান ও সমৃদ্ধ। আর ইসলামী সঙ্গীত এবং কীর্তন-ভজনের এই দ্বৈতধারায় অগ্রসর হয়েও সম্প্রদায়গত পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে তাঁর সাফল্য অপরিমেয়। এর মূলে ক্রিয়াশীল 'ভারতের দুই নয়ন তারা', 'হিন্দু আর মুসলিম মোরা', 'নম নম নম

বাংলাদেশ মম' ধরনের অসাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পৃক্ত নির্ভেজাল দেশাত্মবোধ। একই কবির মানসিক এ ঔদার্য বিশ্বসাহিত্যেও বিরল।

ছয়

বিশ শতকের প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গবিরোধী মানসিকতাসম্পন্ন হিন্দু তরুণদের সমন্বয়ে গঠিত হয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন; যাদের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। এ সংগঠনের কর্মীরা রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণেই মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সাম্প্রদায়িক চিন্তাবোধে তা'রা মুসলমানকে দূরে সরিয়ে রেখে 'একাকী পথ চলা'র অভিপ্রায়ে অগ্রসর হয়। *কুহেলিকা* (১৯৩১) উপন্যাসে নজরুল এ সত্যটি তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক ভাবনাপুষ্ট এ অভিযাত্রা যে সফলতার চেয়ে ব্যর্থতার বোঝাই বয়ে আনবে, সে বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আগাম ইঙ্গিতও প্রদান করেছেন। তাইতো উপন্যাসে দেখি, সংগঠনের কর্মী হিসেবে মুসলিম তরুণ জাহাঙ্গীরের আগমন; সংগঠনের অন্যান্য কর্মীরা যাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কেননা তাদের ধারণা, মুসলমানদের কাছে 'স্বদেশী আন্দোলন মানে হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।' এ ধরনের অজ্ঞতা, অবিশ্বাস ও ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তজনিত সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবে, একথা বুঝতে ভুল করেননি নজরুল। তাইতো উদারনৈতিক মানবিকতায় বিশ্বাসী কবি 'প্রমত্ত'কে দিয়ে বলিয়েছেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িকতার কথা :

> যে দিন ভারত একজাতি হবে সেই দিন ইংরেজকেও বোঁচকা-পুঁটলি বাঁধতে হবে। একথা শুধু যে ইংরেজ জানে তা নয়, রামা-শ্যামাও জানে।

কিংবা

> মুসলমানেরা যদি হিন্দুরাজ্যের ভয়ই করে তাতে তাদেব দোষ দেওয়া চলে না, সমরেশ। তাদের এ ভয় আমাদের আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও ত্যাগ দিয়ে দূর করতে হবে, নইলে পরাধীন ভারতের মুক্তি নেই।

এ আহ্বান ঔপন্যাসিক নজরুলের অন্তর-উৎসারিত উচ্চারণ। আমরা দেখি তাঁর *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০) উপন্যাসে মুসলমান মেজ-বৌ ও প্যাঁকালে খ্রিষ্টান হয়েছে। তাদের এই ধর্মান্তর কোনো ধর্মমতের প্রতি বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণাজনিত কারণে নয়; আর নতুন ধর্ম গ্রহণও কোনো ধর্মের মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে নয়। ঔপনিবেশিক শক্তির হৃদয়হীন শাসনে-শোষণে বিপর্যস্ত ভারত উপমহাদেশের সামগ্রিক

অর্থনৈতিক কাঠামো,— যার বিরাট ভয়াবহতায় আক্রান্ত মেজ-বৌ ও প্যাঁকালের জীবন। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তা তাদের জন্মার্জিত সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসকে টলিয়ে দেয়। বীভৎস দারিদ্র্যের এই নিষ্ঠুর বাস্তবতা থেকে মুক্তির আশাতেই তাদের এ সিদ্ধান্ত। একটি সচ্ছল অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা যদি মেজ-বৌ ও প্যাঁকালের বিচরণ ক্ষেত্র হতো, তবে ধর্মান্তরিত হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসতো না, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং অর্থনৈতিক অসচ্ছলতাই প্রধান কারণ। তাইতো শুধু বেঁচে থাকার সামান্য আশ্বাসে প্যাঁকালের প্রত্যাবর্তন : 'প্যাঁকালেকে স্থানীয় খান বাহাদুর সাহেব একটা কুড়ি টাকার চাকুরী জুটিয়ে দেওয়াতে সে আবার কল্‌মা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে।' অন্যদিকে 'মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ' এর যে শিক্ষা মেজ-বৌকে 'মানুষ হতে' আকৃষ্ট করেছিল; সে শিক্ষায় মেজবৌ তার 'চিরজন্মের অভ্যাস'কে অস্বীকার করতে পারে না। কারণ এ-ভিতের অভ্যন্তরও মানবধর্মের উপাদানেই ভরপুর। তাইতো চিরজন্মের অভ্যাসের গণ্ডীতেই শেষ পর্যন্ত তার প্রত্যাবর্তন। কেননা, আগেই উল্লেখ করেছি, যে কোনো ধর্মমতের সারসত্য একই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত; আর তাহলো 'মানবধর্ম'। বিষয়টি নজরুল তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্র থেকে মেজ-বৌয়ের চরিত্রে সুচারু-সুন্দর নিপুণতায় আরোপ করতে পেরেছিলেন। একে পাবার প্রত্যাশায় ধর্মমত পরিবর্তন বড় কথা নয়-মেজবৌ শেষ পর্যন্ত এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে এবং সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় ধর্মান্তরিত হলেও শেষে তার প্রত্যাবর্তন পূর্ব আচরিত ধর্মে। এখানেও নজরুল তাঁর রক্ত-সম্পৃক্ত অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

•

সাত

সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে সচেতন নজরুল তাঁর এতদ্‌বিষয়ক ভাবনাকে কবিতা, সঙ্গীত, উপন্যাসের মতো প্রবন্ধেও তুলে ধরেছেন। যার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে উদারনৈতিক মানবিকতা সম্পৃক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনা। পৈশাচিক বর্বরতায় উন্মত্ত সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ দিনগুলোতেও নজরুলের তেজস্বী ও অগ্নিদীপ্ত মন্ত্রণা 'মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা'র আহ্বানে উচ্চকিত। *যুগবাণী* (১৯২২), *দুর্দিনের যাত্রী* (১৯২৬), *রুদ্রমঙ্গল* (১৯২৭)-গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে মানবধর্মের প্রতি তাঁর যে চিরন্তন আকুতি, তার পরিচয় বিধৃত :

> ... আল্লা ওর্ফে নারায়ণ হিন্দুও নন মুসলমানও নন। তার টিকিও নেই দাড়িও নেই। একেবারে 'ক্লিন'। টিকি-দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা

স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো। (*রুদ্রমঙ্গল* /হিন্দু-মুসলমান)।

কিংবা

... হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহা গগনতলের সীমা হারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া—মানব!— তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি। বল দেখি 'আমরা মানুষ ধর্ম'। দেখিবে, দশদিকে সার্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই উপেক্ষিত জন-সঙ্ঘকে বুক দাও দেখি, দেখিব এই স্নেহের ঈষৎ পরশ পাওয়ার গৌরবে তাহাদের মাঝে ত্যাগের একটা কি বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগে। এই অভিমানীদিগকে বুক দিয়া ভাই বলিয়া পাশে দাঁড় করাইতে পারিলেই ভারতে মহাজাতির সৃষ্টি হইবে, নতুবা নয়। মানবতার এই মহাযুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ— তুমি সত্য। (*যুগবাণী* /ছুঁৎমার্গ)।

সম্প্রদায়ভেদে মানুষের বাহ্যিক আচার-রীতি-সংস্কার বিচার বিশ্লেষণ নয়; পরম আরাধ্যকে পাবার আশায় ধর্মের যে শাশ্বত মূলমন্ত্র মানুষের সম্বল, সম্প্রদায়ভেদে সেই মূলমন্ত্রই মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত করতে চেয়েছেন নজরুল।

নজরুলের সচেতন মানসলোকে এটাও স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হয়েছিল যে, রক্ষণশীলতা ও সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবাষ্প প্রবীণ হৃদয়কে আজীবন আচ্ছন্ন ও কলুষিত করে রেখেছে, তা পুরোপুরি দূর করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ কারণেই তিনি শিশু মনের উর্বর ভূমিতে অসাম্প্রদায়িক চিন্তার বীজ বপনে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি জানতেন, এ থেকে আশানুরূপ ফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। তাইতো নজরুল তাঁর *পুতুলের বিয়ে* (১৯৩৩) নাটকে পুরুত ঠাকুরকে রক্ষণশীল চিন্তা-চেতনায়ই আচ্ছন্ন রেখেছেন; যিনি ধর্মীয় গোঁড়ামীর সীমানা অতিক্রম করতে দ্বিধাগ্রস্থ। বর ও কনে যেহেতু সনাতন ধর্মাবলম্বী নয়, সেহেতু পুরুত ঠাকুর একটা অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়ার সুযোগ খুঁজতে সচেষ্ট। '... তা হলে ঐ কমলির দাদাই ওদের পুরুত হোক। ওসব যাবনিক অনুষ্ঠান আমার জানা নেই।' অবস্থার চাপে সাময়িকভাবে তার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও তা তার সামগ্রিক মানসলোকের প্রতিচ্ছবি নয়। এর বিপরীতে নাট্যকার নজরুল ইসলামের প্রচেষ্টা, কিশোরী মনের অসাম্প্রদায়িক চিন্তার চিত্র-অঙ্কন। তাইতো পারিপার্শ্বিক অবস্থা-দৃষ্ট খেঁদির উক্তি :

... আচ্ছা ভাই, মুসলমানের পুতুলের সাথে তোর পুতুলের বিয়া হবেক কি করে ?

প্রতি উত্তরে কমলি ও টুলির উক্তি স্মর্তব্য :

কমলি : বাবা বলেছেন, হিন্দু মুসলমান সব সমান। ওদের আল্লা যা, আমাদের ভগবানও তা।

টুলি : সত্যি ভাই, এক দেশে জন্ম এক মায়ের সন্তান। অন্য ধর্ম বলে কি তাদের ঘেন্না করতে হবে ?'

সর্বোপরি খেঁদির উদ্দেশ্যে কমলি ও টুলির কণ্ঠে অসাম্প্রদায়িক বক্তব্যসমৃদ্ধ গান, যা খেঁদির পূর্ব মনোভাবনাকে বিদূরিত করে। কমলি, টুলি ও খেঁদির ভাবনায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ, বিকাশ ও ব্যাপ্তি কবি নজরুলের সচেতন মানসিকতার ফসল। হিন্দু ও মুসলমান পুতুলের মধ্যে বিয়েতে খেঁদির যে আপত্তি ও দ্বিধা তা প্রথমতঃ পরিবেশ ও সমাজলব্ধ অভিজ্ঞতাসম্পৃক্ত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কমলি টুলির সচেতন মনের প্রতিবাদ ও খেঁদির নীরব সম্মতি অবশ্যই স্মরণযোগ্য; যা বিবাহ সম্পাদনে প্রবীণ পুরুত ঠাকুরের মৌন আপত্তি ও ইতস্ততঃ মনোভাবের বিপরীতে আপত্তির সুদৃঢ় দেয়াল তোলে। মূলতঃ ধর্মীয় বিভেদের বিরুদ্ধে মুখর এই কিশোরী মন; ধর্মীয় বিভেদ অতিক্রম করে পারস্পরিক সদ্ভাব ও সহাবস্থানেরই আনন্দে গড়া তাদের পৃথিবী।

আট

যিনি নিজ ধর্মের সারসত্য সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন ; অন্য যে কোনো ধর্মের মূলসত্যের প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা। নজরুলের ক্ষেত্রে এ কথা পুরোপুরি সত্য। বাংলা সাহিত্যে, এমনকি বিশ্বসাহিত্যে অনেকেই অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলেছেন, কিন্তু সামগ্রিক অর্থে রচনাকর্মে কিংবা জীবনাচরণে তার সম্পূর্ণ বিকাশ পরিদৃষ্ট হয় না। কিছুটা হলেও সাম্প্রদায়িকতার ছিটে ফোঁটা বিষবাষ্পে তা'রা আচ্ছন্ন রয়েই গেছেন। ধর্মের মূল সত্যের সঙ্গে আত্মিক সংযোগের অভাব অথবা ব্যবধানই এর মূল কারণ। কিন্তু নজরুল ইসলাম সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক হতে পেরেছিলেন এই কারণে যে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানস-বৈশিষ্ট্য অন্তর উৎসারিত আদর্শ— আত্মার সঙ্গে যার অশৈশব নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও জাতিগত শক্তি প্রদর্শনের এই দ্বন্দ্বমুখর বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে তাই আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক নজরুল-মানস বিশ্লেষণ এবং অধ্যয়ন অপরিহার্য।।

গ্রন্থপঞ্জি

আতাউর রহমান ১৯৮৭ — *নজরুল কাব্য সমীক্ষা*। ঢাকা : মুক্তধারা।

আমীর হোসেন চৌধুরী ১৯৬৮ — *নজরুল কাব্যে রাজনীতি*। ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৫৭ — *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রথম খণ্ড। কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস।

খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন ১৯৭৮ — *যুগ স্রষ্টা নজরুল*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (সম্) ১৩৯৭ — *কাজীর সিমলা ও দরিরামপুরে নজরুল*। ঢাকা : নজরুল ইনস্টিটিউট।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯৬০ — *কেউ ভোলে না কেউ ভোলে*। কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স।

সুশীলকুমার গুপ্ত ১৩৮৪ — *নজরুল চরিত মানস*। কলকাতা : দেজ পাবলিশিং।

সৈয়দ আজিজুল হক ১৯৯০ — *ময়মনসিংহের গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।